



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 527 - 537

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

রবীন্দ্রসংগীতে প্রেম : ‘তোমার পরশ থাকুক আমার হৃদয় ভরা’

ড. অর্পণ রক্ষিত

Email ID: arpanrksht311@gmail.com

 0009-0001-3151-4181

Received Date 15. 06. 2026

Selection Date 15. 07. 2026

Keyword

Rabindranath
Tagore, Rabindra-
sangeet, Love,
Puja, Prem,
Prakriti, Swadesh,
Devotion,
Philosophy,
Nature.

Abstract

Rabindra-sangeet, the bouquet of songs composed by Rabindranath Tagore, represents one of the richest expressions of human emotions in Indian music and literature. Among its central themes, love occupies a unique and multifaceted position, extending far beyond romantic attachment to encompass spiritual devotion, human compassion, universal brotherhood, love for nature, and patriotic affection. This study highlights the concept of love in Rabindra-sangeet through a literary, philosophical, and musicological perspective, examining how Tagore transforms love into a universal principle that unites the individual with humanity, nature, and the Divine. Drawing upon selected songs from various thematic categories—including Prem, Puja, Prakriti, and Swadesh—the research investigates the evolution and diversity of Tagore’s understanding of love.

The study demonstrates that Tagore’s philosophy of love is deeply influenced by the Upanishads, the Bhakti tradition, Vaishnava literature, and his own humanistic worldview. In Rabindra-sangeet, love is portrayed not merely as an emotional experience but as a path toward self-realization, ethical living, and spiritual liberation. Romantic love is presented with subtle psychological depth, emphasizing longing, union, separation, sacrifice, and emotional refinement rather than physical desire. Simultaneously, devotional songs reveal love as complete surrender to the Divine, while songs dedicated to nature celebrate an intimate relationship between human beings and the natural world. Patriotic compositions reinterpret love as responsibility, service, and dedication to the motherland without promoting narrow nationalism, reflecting Tagore’s commitment to universal human values.

The research further examines how musical elements—including melody, rhythm, and expressive performance—enhance the emotional and philosophical dimensions of love in Rabindra-sangeet. Tagore’s careful selection of ragas, talas, and lyrical imagery contributes significantly to the communication of diverse emotional states, making his songs timeless artistic expressions. By integrating literary analysis with musical interpretation, the

study highlights the inseparable relationship between text and melody in conveying the complexity of love.

Ultimately, this study argues that the concept of love in Rabindra-sangeet transcends conventional boundaries of personal affection and emerges as a comprehensive philosophy of life. Tagore's songs advocate harmony among individuals, communities, nature, and the Divine, making love the foundation of universal peace, compassion, and human dignity. The findings underscore the enduring relevance of Rabindra-sangeet in contemporary society, where its message of inclusive and transformative love continues to inspire cultural understanding, moral development, and spiritual enrichment across generations.

Discussion

বাংলা সঙ্গীত জগতের সপ্তর্ষিমণ্ডলের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর সৃষ্টির আলোকে আমরা আলোকিত, তাঁর সৃষ্টি আমাদের বিস্ময়ভর্যার পরশ দেয়, সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর করে। তাঁর সমগ্র সৃষ্টির বিশালতা আমাদের শুধু বিস্মিতই করে না, অনুপ্রেরণা দেয় তাঁকে উপলব্ধি করার। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সৃষ্টির ভাঙারের সর্বোৎকৃষ্ট ফসল হল তাঁর গান - পরিসরেও যা সর্ববৃহৎ, যা কিনা বিষয়ভিত্তিক চর্চা বা আলোচনার দাবি রাখে।

আলোচ্য প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর কথা যদি ধরা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে এই বিষয়টিও যথেষ্টরূপে দীর্ঘ। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাবগত বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনেক সময়ে আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি তার অতলম্পর্শী গভীরতা। কখনো পুজার গানে ভক্ত কবির ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিপ্রাণতা প্রেমের ভাষায় প্রকাশিত, আবার প্রেমের গানে নরনারীর পার্থিব প্রেম কখনো মনুষ্যালোকের উর্দে উঠে তা কল্পলোকের প্রেমে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রকৃতির গানে প্রকৃতিপ্রেমিক কবির প্রকৃতির নৈসর্গিক রূপের মোহে মোহিত হয়ে তাঁর ভাবানুভূতি প্রকাশের মাধ্যম হয়ে উঠেছে, স্বদেশের গানে স্বদেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেম, দেশমাতৃকার প্রতি ভালোবাসা ধ্বনিত হয়ে ওঠে। বিচিত্র, আনুষ্ঠানিক এমনকি নাটকের গানেও সেই প্রেমানুভূতি বিরাজমান। স্বভাবতই এই গানগুলিই আমাদের সামনে পরিচিতি লাভ করিয়ে দেয় কবির আরো একটি দিক- তাঁর প্রেমিকসত্তা। স্বয়ং স্রষ্টার কথায় -

“আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে

সৃষ্টির প্রথম রহস্য, আলোকের প্রকাশ,

আর সৃষ্টির শেষ রহস্য, ভালোবাসার অমৃত।”^১

১২৯২ সালে প্রকাশিত ‘রবিচ্ছায়া’ নামক গীতসংকলনে ‘বিবিধ সংগীত’ শিরোনামে কবির গীতসংখ্যা ছিল ১১৬টি যার অধিকাংশই প্রেমের গান। তাঁর প্রথম বয়সের প্রেমানুভূতি এই গানগুলির আনন্দ বিষাদের আখরে ধরা পড়েছিল। অধিকাংশ গানেই একটি বিফল নৈরাশ্য, অনির্দিষ্ট বিষম্বতা, ব্যর্থ হৃদয়বেদনা বাসা বেঁধেছে পড়েছে। বিশিষ্ট রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ ও অধ্যাপক প্রয়াত ডঃ অরুণকুমার বসুর কথায় -

“কিশোর ও অপরিণত যৌবনকালের প্রেমসংগীতগুলিতেই তাঁর কবিজীবনের যথার্থ আত্মপ্রকাশ ঘটেছে।”^২

রবীন্দ্রনাথের মরমিয়া মন প্রকৃতি, মানব ভগবান - সবকিছুর মধ্যেই এক সমন্বয় খুঁজে পেয়েছে। এই প্রেমদৃষ্টি দিয়ে, সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করা রস রবীন্দ্রনাথের গানের কথায় সুরে পূর্ণ হয়েছে। কবির স্নেহধন্য প্রবাদপ্রতিম রবীন্দ্রসঙ্গীত সাধিকা প্রয়াত শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় -

“আধ্যাত্মমার্গের পথিকদের মতো রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুভূতিকে শুধু তত্ত্বের বা ধর্মবোধের সামগ্রী করে রাখেননি। এক আনন্দলোকে বসে তিনি তাঁর সমস্ত রস আশ্বাদন করেছেন, এবং তাঁর কাব্য ও সংগীতামোদীকেও সেই আনন্দলোকে নিয়ে গেছেন। পরিপূর্ণ প্রেমের উপলব্ধি ভগবানের উপলব্ধির সামিল। সেই প্রেম পৃথিবীর হয়েও পার্থিব কামনা-বাসনা বর্জিত।...”^৩

রবীন্দ্রনাথের গানের মরমিয়া সুর ঐশ্বরিক না হয়েও বেশি মাত্রায় মানবিক। তিনি এই পৃথিবীকে, প্রকৃতিকে, মানুষকেই ভালোবেসেছেন। তাই তিনি বারবার মানুষের মধ্যেই ভগবানের লীলা, মানুষের প্রেমের জন্য ভগবানের প্রেমভিত্তিক হৃদয়ঙ্গম করেছেন। কবির ব্যাখ্যায় –

“একমাত্র প্রেমের মধ্যেই সমস্ত দ্বন্দ্ব একসঙ্গে মিলে যেতে পারে। যুক্তিতে তারা কাটাকাটি করে, কর্মেতে তারা মারামারি করে, কিছুতেই তারা মিলতে চায় না, প্রেমের সমস্তই মিটমাট হয়ে যায়।”^৪

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে বাঙালী হৃদয়ে তাঁর গান চিরস্থায়ী হবে। সুখে-দুঃখে আনন্দে বিষাদে তাঁর গান না গেয়ে বাঙালীর উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথ প্রয়াত হয়েছেন আজ ৮৪ বছর অতিক্রান্ত। কিন্তু তাঁর সেই চেতনা আর বিশ্বাস আজ প্রমাণিত। তাঁর গানের সুবিশাল ধন ভাণ্ডারের জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান। দিনে দিনে তাঁর গানের ভাণ্ডার থেকে আবিস্কৃত হচ্ছে নিত্যনূতন মণিমাণিক্য। তাঁর গানের আলোচনায় উঠে আসছে অনাবিস্কৃত দিক। এই রচনার উৎস সেই সুবিশাল কর্মযজ্ঞ। সময়ের সাথে সাথে প্রেমের সংজ্ঞা নানাভাবে পরিবর্তিত হলেও রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যে দিয়ে প্রেমকে বা আপন প্রেমিকসত্তাকে প্রকাশ করবার প্রয়াস আজও চলমান ও বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। আমাদের এই আলোচনার মূল উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের প্রেমিকসত্তাকে তাঁরই সৃষ্ট বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে আবিষ্কার করা।

পূজার গানে প্রেম : ‘তোমার প্রেমে ধন্য কর যারে’ — পূজা, প্রেম ও প্রকৃতি – এই তিন ভুবনেই রবীন্দ্রনাথের স্বচ্ছন্দ বিচরণ। সংখ্যার হিসেবে সবচেয়ে বেশি পূজাপর্যায়ের গান – ৬১৭টি। সকলেই একথা স্বীকার করেন যে এই তিনটি পর্যায়ের গান অবলীলায় অন্য পর্যায় হিসেবে গীত হতে পারে, কারণ রবীন্দ্রনাথের ঐশী চেতনা, প্রেমচেতনা বা প্রকৃতিচেতনা কখনোই একটি বিশেষ গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকেনি, সবসময়েই তার উত্তরণ ঘটেছে এক অতীন্দ্রিয় পরিমণ্ডলে।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন লীলাবাদী। ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের লীলার সম্পর্কে তিনি বিশ্বাস সমর্পণ করেছিলেন। ভারতীয় দর্শনে বেদান্তের দুই মূল ব্যাখ্যাকার শঙ্করাচার্য ও রামানুজ। রামানুজের মূল বক্তব্য হল এই জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে। জগৎ ও জীবকে বাদ দিয়ে ব্রহ্ম বা পরমশক্তির কোনও অস্তিত্ব নেই। এই বক্তব্যকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন রামানুজ দ্বারা প্রভাবিত বলে মনে করা হয়ে থাকে। তিনি তাঁর রচনায় ব্রহ্মের সৃষ্ট জগৎ ও জীবকে সমমর্যাদা দান করেছেন। ‘গীতাঞ্জলি’তে কবি বলেছেন যে ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর জন্মজন্মান্তরের প্রেমসম্পর্ক। তাই তাঁর গানে এত ‘তুমি’ ও ‘আমি’র খেলা। আমাকে নিয়েই তুমি। তাই কবি বলেন –

তাই তোমার আনন্দ আমার ‘পর

তুমি তাই এসেছ নীচে

আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর

তোমার প্রেম হত যে মিছে।।

“বিশ্বদেবতার পূর্ণতার আদর্শ কবির জীবনের মধ্য দিয়েই বিবর্তিত। ‘গীতবিতান’-এর ‘বন্ধু’ উপপর্যায়ের গানগুলি মুখ্যত কবির লীলাবাদী ধ্যানধারণাকেই প্রচার করে। ব্যক্তিহৃদয়ের আবেগে উপলব্ধির গাঢ়তায় কবির ঈশ্বরচেতনা এগুলিতে অনুরঞ্জিত।”^৫

‘খেয়া’-তে কবির নবজন্মলাভের এক সূচনা লক্ষ্য করা যায়। যে কবি এত জ্ঞানলব্ধ কথা উদাত্ত ধ্বনিতে আমাদের শুনিয়েছেন, যাকে দেখেছি উর্বরসীর সৌন্দর্য্য, নয়ন ও মন বসুন্ধরার সুবিস্তৃত বক্ষে আপনাকে বিস্তারিত করতে, সেই বিশিষ্ট, বলিষ্ঠ, সৌন্দর্য্যপিপাসু কবিচিন্তা ‘খেয়া’-র পর থেকেই এক অন্তহীন গভীর প্রেম ও আবেগে যেন শিহরিত হয়ে উঠল, নিজেকে একান্ত দীন, কাঙাল বলে মনে হতে লাগলো। কবি যেন হৃদয়কে একেবারে অনাবৃত করে দেবতার সামনে অঞ্জলি করে তুলে ধরলেন। সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যে রসের শায়রে যিনি এতদিন ডুবে ছিলেন তিনি যেন প্রেম সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের স্বরূপকে আবার জন্য আকুল হয়ে উঠলেন। ‘খেয়া’ থেকেই এর প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল, ‘গীতাঞ্জলি’-তে তা একটা স্পষ্ট রূপ ধারণ করে, পরিপূর্ণতা পায় ‘গীতিমাল্য’ ও ‘গীতালি’তে।

১৮৯৪ সালে রচিত ‘অন্তর্যামী’ কবিতাটিকে কবির বাল্যজীবনের চাবিকাঠি বলা যায়। যিনি অন্তর্যামী, তিনিই জীবনদেবতা, আবার লীলাসঙ্গীও তিনি।

যিনি পরম তিনি যদি প্রিয় না হন, আপনার জন না হন তাহলে যোগসাধন কেমন করে সম্ভব? আত্মীয় যোগে তাকে বাঁধতে না পারলে কেমন করে হবে মিলন! তাই হৃদয়ভূমিতে তাঁরই আবাহন যাকে আমরা ভালোবাসি। প্রিয়তম এবং প্রিয়তমা যেমন পরস্পরের কাছে নিজেদের সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে তেমনি যিনি পরম শ্রেয় তাঁকেও সেই আসনে বসাতে হবে। কেবল বহির্বিষয়েই নয় হৃদয়ের মধ্যেও তাঁর স্থাপনা আবশ্যিক। তাই কবি বলেন-

“দাঁড়াও আমার আঁখির আগে
তোমার দৃষ্টি হৃদয়ে লাগে।”

এই স্থাপনার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতে হবে। কবি তাই বলেন -

“যদি এ আমার হৃদয়দুয়ার বন্ধ রহে গো কভু
দ্বার ভেঙে তুমি এসো মোর প্রাণে ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু।”

কতগুলি গানে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের জন্য ব্যাকুলতার ভাবটি পরিস্ফুট। তার মধ্যে একটি গান -

“ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা
প্রভু তোমার পানে।”

ভক্তের এই আকুল আহ্বানে ভগবান সাড়া না দিয়ে পারেননা। তখনই চলে মিলনের প্রতীক্ষা। কবির ব্যাখ্যা যে প্রেমের একদিকে দ্বৈত একদিকে অদ্বৈত। একদিকে বিচ্ছেদ এক দিকে মিলন। একদিকে বন্ধন অন্যদিকে মুক্তি যার মধ্যে সীমা ও অসীম মিলেমিশে একাকার। তাই কবি গাইলেন -

“সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।”

রবীন্দ্রনাথ বলছেন -

“ত্যাগের সঙ্গে প্রেমের ভারী একটা সম্বন্ধ আছে। ... প্রেম ছাড়া ত্যাগ হয় না; আবার ত্যাগ ছাড়া প্রেম হতে পারে না ... আমরা প্রেমে যা দিই তাই সম্পূর্ণ দিই, কিছুই তার আর বাকি রাখি নে, সেই দেওয়াতেই দান কে সার্থক মনে করি...”^৬

এই ভাবনাই ফুটে ওঠে একটি গানে -

“আমার যে সব দিতে হবে
সে তো আমি জানি
আমার যত বিত্ত, প্রভু আমার যত বাণী।।”

রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মের পরিবেশের মধ্যে মানুষ হলেও তিনি ছিলেন মূলতঃ কবি। তাঁর অধ্যাত্মসাধনা ও উপলব্ধি তাই রূপ ও রস সাধনাকে অস্বীকার করতে পারেনি। ‘গীতাঞ্জলি’, ‘গীতিমাল্য’, ‘গীতালি’ র যুগের সাধক কবি রবীন্দ্রনাথ কবীর, নানক, মীরাবাই প্রমুখ সাধক কবিদের সমগোত্রীয়। সকলেরই অধ্যাত্মদৃষ্টির সামনে ধরা দিয়েছিল বিশ্বজীবনের সকল রূপের মধ্যে অপরূপের লীলা। রবীন্দ্রনাথও জীবনের পরিসরকে সকল রূপের মধ্যে এক নিত্য অপরূপের লীলা হিসেবেই দেখেছেন। তাই তাঁর অধ্যাত্মমানসের আশ্রয় হচ্ছে প্রকৃতির বিচিত্র প্রকাশ, মানবজীবনের বিচিত্র লীলা। এই প্রসঙ্গে একটি গানের উল্লেখ আসে। ‘পূজা’ পর্যায়ের অন্তর্গত গানটি হল -

“যদি প্রেম দিলে না প্রাণে
কেন ভোরের আকাশ ভরে দিলে এমন গানে গানে।।”

এই গানটি প্রসঙ্গে কবির স্নেহভাজন শ্রী শৈলজারঞ্জন মজুমদার বলেছেন -

“কবিচিত্তে বিশ্বভুবনময় ব্যাপ্ত আনন্দের মাঝখানে আপন অন্তরে এক পরম শূন্যতাকে নিবিড়ভাবে অনুভব করছে। কবি প্রশ্ন করছেন এই বন-গন্ধ শোভার এত আয়োজনের মধ্যে কেন প্রেমহীন তাঁর অন্তর। আমাদের মনে করিয়ে দেয় মরমী সাধকদের আত্মার ঘোর রজনীর কথা। হৃদয় যাকে পেতে তিনি প্রেমস্বরূপ, তাঁর প্রেম যখন হৃদয়কে অধিকার করে তখনই আসে পরম মিলনের মুহূর্ত।”^৭

“অনেক ক্ষেত্রেই পূজা ও প্রেমে একটা একটা সমান্তরালতা আছে সেটা স্বীকার্য, আর যেখানেই সেই সমান্তরালতা (এবং কখনো-কখনো অভেদত্ব), সেখানে পূজার গানেও ইতিহাস প্রবেশ করে (আমারে তুমি অশেষ করেছ এমনি লীলা তব), সেখানে পূজার গান ঐতিহ্যবাহিত ভক্তির স্রোত থেকে ভিন্ন হয়ে ওঠে।”^৮

রবীন্দ্রনাথ ‘প্রেম’ শব্দটিকে অন্যতম এক মাত্রা দিয়ে তার অন্যতম তাৎপর্য রচনা করেছেন কতবার। যদি ধরা হয় এই গানটি-

“যদি প্রেম দিলে না প্রাণে
তা হলে সেই সঙ্গে মনে পড়তে পারে
আকাশে দুই হাতে প্রেম বিলায় ও কে
সাথে সাথে মনের গোচরে আসে
আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হত যে মিছে॥”

এইরকম গান যেখানে প্রেম ও পূজা একাকার হয়ে যায়, সেখানে প্রেম ক্ষুদ্র জীবনান্তিকে ছাড়িয়ে অতিরিক্ত কোনো মাত্রা সংযোজিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের পূজা-সঙ্গীতগুলি সম্পর্কে যে কোন আলোচনাই অসম্পূর্ণ থাকতে বাধ্য। একটি মহৎ মহাকবির সমগ্র জীবনের ঈশ্বরানুভূতির যে বিচিত্র স্তর পরম্পরা, সমালোচক তার সামান্য অংশও ব্যাখ্যা করতে অসম্পূর্ণ হবেন। উপনিষদের যুগ থেকে মধ্যযুগীয় লোকায়ত সাধকদের মরমী সাধনায় রবীন্দ্রনাথের অনায়াস সঞ্চার ছিল। একদিকে যেমন বৈদিক ঋষিদের কণ্ঠের অনুবাদ কবির গানে বেজে উঠেছে, অন্যদিকে কবীর, নানক প্রমুখ সাধকদের সহজ ভক্তিবিশ্বাস, বাউলদের সহজিয়া সাধনার প্রতিধ্বনি শুন। আবার সূফীধর্মে ঈশ্বরকে প্রেমিকরূপে দেখার কল্পনা, বৈষ্ণবীয় অভিসার— রবীন্দ্রনাথ সবই তাঁর ভক্তিসঙ্গীত গ্রহণ করেছেন। তবু রবীন্দ্রনাথের ভক্তিতে নতুন স্বতন্ত্র, সমস্ত সাধনার ধারাই তাতে মিলিত হয়ে একটি যৌগিক ধর্মানুভূতি গড়ে তুলেছে। মনে হয় ‘আনন্দ’-ই সেই একমাত্র শব্দ যার সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের ভক্তিসাধনার মর্মকথাটি নিঃসন্দেহে চিহ্নিত করা যায়। এই আনন্দেই বিশ্বচেতনের সঙ্গে তাঁর যোগ, বিশ্বেশ্বরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। তাই কবি বলেন—

“গোপনে প্রেম রয় না ঘরে আলোর মত ছড়িয়ে পড়ে
সবার তুমি আনন্দধন হে প্রিয় আনন্দ সেই আমারো।”

অথবা -

“ওগো সবার, ওগো আমার বিশ্ব হতে চিত্তে বিহার
অন্তহীন লীলা তোমার নূতন নূতন হে।।”

প্রেমের গানে প্রেম : ‘চির অচেনা পরদেশী’ — রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনে দেবতা ও মানব যেমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তেমনি তাঁর সংগীতেও দেবতা ও মানব প্রায় এক চেতনভূমিতে মিলিত হয়েছে। ১২৮৩ সালের কার্তিক মাসে মাত্র ১৫ বছর বয়সে ‘জ্ঞানাক্ষর’ পত্রিকায় গ্রন্থসমালোচনা প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন -

“...যখন প্রেম, করুণা, ভক্তি প্রভৃতি বৃত্তিসকল হৃদয়ের গূঢ় উৎস হইতে উৎসারিত হয়, তখন আমরা হৃদয়ের ভার লাঘব করিয়া তাহার গীতিকাব্যরূপ স্রোতে দিই।”^৯

রবীন্দ্রনাথের প্রেমসংগীতগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে এই উক্তিটি অসাধারণ মূল্যবান। সংগীতজীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি যে প্রেমবিষয়ক সংগীতগুলি রচনা করেছেন তার সাহায্য না নিলে কবির প্রেমচেতনার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। নরনারীর ব্যবহারিক সম্পর্ক ও প্রেমবিবেধকে বিশুদ্ধ অধ্যাত্ম আদর্শে ও নিরাপটভূমিতে স্থাপন করে তিনি বৈষ্ণব-সাহিত্যের মত এক অতুলনীয় প্রেম-পদাবলী রচনা করেছেন। বিশিষ্ট গবেষক ডঃ সুধাংশু শাসমল-এর কথায়—

“এখানে প্রেমের ভেতরে এসেছে স্বতঃস্ফূর্ত প্রীতি মাধুর্য, ভক্তি, ভালোবাসা, দুঃখ, বিরহ, কলুষহীন উন্নত অনুভব; তারই অত্যন্ত দিব্য-রসস্ফূর্তি এইসব গানগুলোতে।”^{১০}

গীতবিতানের প্রেম পর্যায়ে গানের সংখ্যা ৩৯৫টি। যার মধ্যে ‘গান’ বিষয়ক ২৭টি এবং অন্যান্য ৩৬৮টি। যেগুলিকে কবি ‘প্রেমবৈচিত্র’ নামে কবি তাদের সন্নিবেশিত করেছেন। পূজা পর্যায়ে উপপর্যায়ের মতো প্রেম পর্যায়ে কবি কোন উপপর্যায়ে ভাগ করেননি। বিরহবেদনাই যে প্রেমের সর্বোত্তম প্রকাশ সেখানে সূক্ষ্মতর প্রসঙ্গভেদ হয়তো কবির কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়েছিল যদিও ‘প্রেমবৈচিত্র’ শব্দটি তাদের বিচিত্রতার নিশ্চিত নির্দেশ।

প্রেম পর্যায়ে বহু গানকেই ঈশ্বরে নিবেদিত ভক্তিগীতি বলে মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ ‘সানাই’ কাব্যের অন্তর্গত ‘তুমি কোন ভাঙনের পথে এলে’। বিশিষ্ট অধ্যাপক শ্রী সুধীর চক্রবর্তীর কথায় –

“ভাঙনের পথে যার দৈব আগমন তার অভিসার ঝড়ের রাতে ও নয় এবং সে নয় রবীন্দ্রনাথের বহু চেনা দুঃখ-রাতের রাজা। এ একেবারে নতুন। হয়তো নামান্তর প্রেম। যা ভাঙনের পথ ধরে এসে আমাদেরই ভেঙে দেয়। ঘুচে যায় সৃষ্টির জড়িমা। তাই তার দুঃস্থ চরণপাতে নিজেই ধন্য বলে মানতে হয়।”^{১১}

এই প্রসঙ্গেই চলে আসে আরও একটি গান। ‘ভানুসিংহ’ কাব্যের অন্তর্গত এই গানটি হল—

“তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা।”

গানটি প্রেম পর্যায়ে অন্তর্গত হলেও এ গানের প্রতিটি ছন্দে যেন সেই ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিপ্রাণতা প্রকাশিত।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র প্রেম পর্যায়ে গান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বিরহের গান মিলনের গানের তুলনায় বেশি। সুর ও বাণীর জগতে বিরহপ্রদীপেই তিনি প্রেমের উজ্জ্বল শিখা দেখেছেন। এই বিরহই তাঁর প্রেমের মূল সুর। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রেমসঙ্গীতগুলির মধ্যে এই বিরহবেদনার ঐক্যসূত্রে একটা মানসপ্রতিমাকে অঙ্কিত করে নিতে ইচ্ছা করে। তাই গান দিয়ে বলা যায়—

“ওগো আমার চির অচেনা পরদেশী
ক্ষণতরে এসেছিলে নির্জন নিকুঞ্জ হতে কিসের আহ্বানে।”

পূজা পর্যায়ে গানে আমরা দেখেছি ‘তুমি-আমি’-র বিন্যাস প্রায় সমান সমান। সেখানে কবি বলেন—

“আমার বেলা যে যায় সাঁঝবেলাতে
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে।”

এই সুর-মেলানোর সাধনা অনেকটা সম্পন্ন হয়ে আসে পরবর্তীকালে। তাই প্রেম পর্যায়ে গানে আমরা দেখি সুরের উৎসে আছে ‘আমি’—

“তোমায় গান শোনাবো
তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখো।”

বিশিষ্ট কবি শঙ্খ ঘোষ বলেন—

“আত্ম-আবরণ মোচনের প্রবল বেদনায় মথিত হয়ে উঠে এই গানগুলি দাবি করে আমাদের সমস্ত সত্তা, আর তখন মনে হয় এর চেয়ে বড়ো মন্তন, এর চেয়ে বড়ো প্যাশান বা বাসনার তাপ আর যেন নেই আমাদের অভিজ্ঞতায়। ... আমি আর আমার ভিতরে-বাইরে ব্যাপ্ত এক তুমি, এরই মধ্যে এক নিবিড় বেদনা-সম্পর্ক জাগিয়ে তোলে গান, গানের সেই সেতু।”^{১২}

প্রেমের অনুভূতি তাঁকে রোমান্টিক ভাবের দিকে চালিত করেছে। ‘মানসী’ কবি অনুভব করেছেন বাস্তব জগতের নরনারীর প্রেম ভোগ করতে গেলে প্রেমের যে নিজস্বতা তা উপলব্ধি করা যায় না। মানবীয় যে প্রেম তা অখণ্ড প্রকাশ। খণ্ড প্রেমে কোন তৃপ্তি নেই। সেটি একটি গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। গানটি হল -

“আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ।”

কবির কথায় তিনি প্রেমকে সুরের বাঁধনে বাঁধার চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতির যে অনন্ত প্রেম তা তিনি গানের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

কবি প্রেমকে দেহের মধ্যে আবদ্ধ রাখেননি। তাঁর প্রেম দেহ, মন ছাপিয়ে গেছে। একটি গানের মধ্যে সেটি আমরা দেখতে পাই। গানটি হল—

“তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম
নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমা নিশীথিনীসম।”

এই গানটির মধ্য দিয়ে কবির প্রেম নিঃশব্দ। সেটা হৃদয়ে থাকে। তাঁর মন জুড়ে আছে সেই। তাঁর অঞ্চলছায়ায় সে ঢেকে আছে। কবি ‘মানসী’ কাব্যে বলেছেন যে পুরাতন প্রেম যদি নতুন প্রেমজালে ঢাকা পড়ে যায় তখন দ্বৈত প্রতি তাঁর অনুভব ‘তবু মনে রেখ’। এই গানের সঙ্গে তুলনা করা যায়—

“পুরানো জানিয়া চেয়ো না আমারে।”

সুতরাং বিচ্ছেদ বিরহের দ্বারাই কবির প্রেম প্রদীপ্ত। এই বিরহের বার্তাই কবির প্রেমভাবনার ধ্রুবপদ। কবি তাই বলেন—

“প্রেম বলে যে যুগে যুগে
তোমার লাগি আছি জেগে।”

গান দিয়েই কবি বিরহকে স্পর্শ করেছেন। বলেছেন—

“যার বিরহের নাই অবসান
তার মিলনে আনে ভাষা।”

এ ছাড়াও ‘মম দুঃখের সাধন’, ‘যদি হায় জীবনপূরণ নাই হলো’, ‘ভরা থাক স্মৃতিসুধায়’, ‘দিনের পরে দিন যে গেল’ ইত্যাদি শেষ বয়সে রচিত প্রেমসংগীতগুলিও কবির প্রেমবেদনার স্মৃতিমূলক বিরহরাগে অনুভবিত।

প্রকৃতির গানে প্রেম : ‘সুখে শিহরে সকল বনরাজি’— প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ - এই বক্তব্য যেমন সত্য, তেমনি সত্য যে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সৃষ্টির মধ্যেই রয়েছে তাঁর অনন্ত উপকরণের বিচিত্র সমাহার। গান আর প্রকৃতির মধ্যে যে অনুভব তা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির মধ্যে যতখানি মর্যাদা পেয়েছে, বাংলা গানের আর কোনো ধারায় তার ন্যূনতম উপস্থিতির নিদর্শন নেই। ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৮৯৫ সালে শিলাইদহ থেকে ইন্দিরা দেবী কে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

“প্রকৃতির সঙ্গে গানের যত নিকট সম্পর্ক এমন আর কিছু না ... আমি নিশ্চয় জানি এখন যদি আমি জানলার বাইরে দৃষ্টি রেখে রামকেলি ভাঁজতে আরম্ভ করি তা হলে এই রৌদ্ররঞ্জিত সুদূরবিস্তৃত শ্যামলনীল প্রকৃতি মন্ত্রমুগ্ধ হরিণীর মতো আমার মর্মের কাছে এসে আমাকে অবলেহন করতে থাকবে। যতবার পদ্মার উপর বর্ষা হয় ততবারই মনে হয় মেঘমল্লার রাগে একটা নতুন গান রচনা করি। ... কথা তো ঐ একই — বৃষ্টি পড়ছে, মেঘ করেছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। কিন্তু তার ভিতরকার নিত্যনূতন আবেগ, অনাদি-অনন্ত বিরহবেদনা সেটা কেবল গানের সুরে খানিকটা প্রকাশ পায়।”^{১৩}

প্রকৃতি পর্যায়ে রচিত তাঁর গানগুলি শুনলে অবাক লাগে যে কি অনায়াসে নানা ধরনের গানে প্রকৃতিকে নিয়ে মালা গেঁথেছেন, মিলিয়ে দিয়েছেন ফুল ফোটানোর আনন্দকে। কোনো কোনো গানে জীবন আর প্রকৃতি যেন একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে। শ্রী শান্তিদেব ঘোষ এই প্রসঙ্গে বলেছেন—

“গুরুদেব মনে করতেন আনন্দের সাধনার পথে প্রকৃতি মানুষের একটি বড়ো অবলম্বন। প্রকৃতি আমাদের চারিদিকে যে সৌন্দর্য বা আনন্দ বিতরণ করে তা আমাদেরই ভোগের জন্য।”^{১৪}

সারাজীবন প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে থাকার ফলে প্রকৃতির প্রতি কবি একটি অন্তরঙ্গ আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন একথা যেমন সত্য, তেমনি অদ্বৈতবাদী উপলব্ধিতে অভিব্যক্তির ধারায় প্রকৃতির প্রতি একপ্রকার আবেগপূর্ণ জন্মান্তরীণ আকর্ষণও অনুভব করেছেন। আর সেই বিশ্বপ্রকৃতির আনন্দরোমাঞ্চ তাঁর গান ছাড়া এমন করে কোথায় সার্থক হয়ে উঠবে!

‘গীতবিতান’-এর প্রকৃতি পর্যায়ের গানের সূচনাপর্বেই আমরা পাই কবি রচিত সুপরিচিত সেই গান যা প্রকৃতির প্রতি কবির প্রেমানুভূতির যেন শুভারম্ভ—

“আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্বভরা প্রাণ
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।।”

বাংলা গানে অতি সামান্য হলেও বর্ষা বা বসন্তের গানে প্রেমসঙ্গীতের কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু অন্য ঋতু অস্পৃশ্যই থেকে গেছে। এমনকি বর্ষা, বসন্ত তার নানা রূপ, নানা রং দিয়ে এমন বিচিত্র অনুভবসম্পন্ন হয়ে রবীন্দ্রনাথের আগে কি কোনো গানে ধরা পড়েছে? এখানেই রবীন্দ্রনাথ শুধু অন্যতম নন অনন্যতম। জীবনের সঙ্গে প্রকৃতির যে নিবিড় যোগ তার প্রতিফলন যে সব ঋতুর গানে পড়েছে তা যেন এক অন্য মাত্রা যোগ করে। কেবল গানের সংখ্যা নয়, কেবল সুর-তাল-লয় নয়, কেবল ঋতুর বিচিত্র রূপ নয় সমগ্র ঋতুসঙ্গীতের মধ্যে যে অনুভব, প্রত্যাশার যে প্রখর দীপ্তি, যে জীবনবোধ, যে নিদর্শন রয়ে গেছে যা পরতে পরতে খুলে দেয় ‘এ-আমি র আবরণ’ সেখানেই তার অনন্যতা।

উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি গানের আলোচনা এই প্রসঙ্গে উঠে আসে। গ্রীষ্ম ঋতুর একটি অন্যতম গান “মধ্যদিনের বিজন বাতায়নে”। ৬৩ বছর বয়সি কবি এই গান রচনা করেন ১৩৩১ এর বৈশাখে। গানটিকে অপরিহার্য ভাবে গ্রীষ্ম ঋতুর অন্তর্গত প্রেমসঙ্গীত হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। গানটি যেন স্মৃতিভারে মস্তুর, বিরহকাতুর ও করুণ বেদনায় অশ্রুসিক্ত। বিশিষ্ট রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ ও অধ্যাপক প্রয়াত ডঃ অরুণকুমার বসুর কথায় –

“কবির অতীতকালের কোন প্রেমস্মৃতি আজ বৈশাখের প্রভাতী হাওয়ায়, চাঁপা ও বকুলফুলের গন্ধে ব্যাকুল ‘ক্লাস্তিভরা কোন বেদনার মায়া স্বপ্নাভাসে’ প্রৌঢ়মনের প্রান্তে ভেসে আসে।”^{২৫}

রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রিয় ঋতু বর্ষা। গীতবিতানের বর্ষা পর্যায়ের গানগুলিতে কবির বিচিত্র অনুভূতিপূর্ণ সম্পর্কিত হয়েছে। বর্ষার নৈসর্গিক রূপ রবীন্দ্রনাথের গানগুলিতে অপরূপতা লাভ করেছে। ঋতুপ্রকৃতি, অভিসার, বিরহবেদনা, মিলনোৎকর্ষী, অতীতস্মৃতি, নিঃসঙ্গতা সবকিছুকেই ছুঁয়ে গেছে তাঁর বর্ষার গান। যেমন ‘আজ কিছুতেই যায় না মনের ভার’ ব্যর্থ দিবাভিসারের গান। ‘তিমির অবগুণ্ঠনে বদন তব ঢাকি’ গানে কবির তীব্র মিলনোৎকর্ষী প্রকাশ পায়। আবার কবির শেষ বয়সে রচিত ‘আমার প্রিয়ার ছায়া আকাশে আজ ভাসে’ গানে কবির অতীত স্মৃতি রোমন্থন বর্ষার পটভূমিতে ব্যক্ত। কিন্তু বর্ষার গানে আছে এক অসীম বিরহানুভূতি যা কবি নিবিড় নিঃসঙ্গতাবোধ, অতীত স্মৃতির উন্মথিত বেদনা ও নিরুপায় মিলনের নিমেষহারা উৎকর্ষায় বেঁধেছেন। এক অসম্ভব অমূলক প্রত্যাশায় তাঁর ছায়ামূর্তিখানিকে সত্য বলে মনে করেছেন ব্যাকুল বাদল সাঁঝের বৃষ্টিকাতর মুহূর্তে—

“কোন দূরের মানুষ যেন এল আজ কাছে
তিমির-আড়ালে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে।”

শরৎ ঋতুর একটি গান ‘এবার অবগুণ্ঠন খোলো’ গানেও শরতের শিশিরভেজা, শিউলি-সুরভি রাতে বিরহ-মিলনের দোলায় প্রেমের আকুতি সুস্পষ্ট —

“বিরহ মিলনে গাঁথা নব প্রণয়দোলায় দোলো।”

শারদোৎসব নাটকের নাট্যরূপান্তর ঋণশোধ-এর ভূমিকায় আছে একটি অসামান্য গান—

“হৃদয়ে ছিলে জেগে দেখি আজ শরৎমেঘে।”

প্রকৃতি পর্যায়ের শরৎ ঋতুর এই গানটি যেন শরতের উৎসবমুখর প্রকৃতির মাঝে কবির প্রিয়জন বিচ্ছেদের শোকবেদনারই সাংগীতিক রূপ। হেমন্ত ঋতুর একটি অন্যতম গান—

সে দিন আমায় বলেছিলে আমার সময় হয় নাই
ফিরে ফিরে চলে গেলে তাই

এ শুধু ঋতুসঙ্গীত নয়। এর মধ্যে ধরা পড়ে প্রেমের এক গভীর দ্যোতনা যা কোন নির্দিষ্ট গভীর মধ্যে ধরা পড়ে না।

আবার বসন্ত পর্যায়ের গানগুলির সবকটিই প্রায় প্রেমের সুগন্ধে সুবাসিত। আর সেখানেও বিরহের দীর্ঘশ্বাসই প্রবল। বসন্তের গানগুলি উৎসবের মধুছন্দা বাঁশির অন্তরালে একটি তৃষিত স্মৃতিকাতর প্রাণের আতুর আর্তনাদ বহন করে নিয়ে চলেছে। যেমন ‘কার যেন এই মনের বেদন’ কিংবা ‘বেদনা কী ভাষায় রে’ অথবা ‘অনেক দিনের মনের মানুষ’ অথবা ‘মম অন্তর উদাসে’ ইত্যাদি।

এইভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি পর্যায়ের গানগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে ঋতুর বর্ণনার পাশাপাশি কবি তাঁর প্রকৃতির প্রতি তাঁর আত্মীয়তা ও নিবিড় প্রেমবন্ধন প্রকাশ করেছেন। ঋতুসঙ্গীতগুলি তাই কবির সঙ্গীতসৃষ্টির মুগ্ধ বিস্ময়ে, নিবিড় আনন্দবেদনায়, রোমাঞ্চিত মর্ত্যপ্রেমে, জীবনস্বাদের অতৃপ্ত অতৃপ্তিতে সিঞ্চিত।

স্বদেশের গানে প্রেম : “ও মা তোমার কোলে ছুটে আসি”— ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে বিপুল দেশগৌরবী গানের একটি সুমহান ঐতিহ্য আছে। অথও বঙ্গের স্বদেশ গৌরবের গানের ইতিহাস প্রায় শতবর্ষের কোঠায় বিস্তৃত। আর সে ঐতিহ্যের স্বর্ণ শিখরের নাম রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গান আমাদের গর্ব। পূজা, প্রেম ও প্রকৃতির পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের প্রেমিকসত্তার আর একটি উন্মোচিত দিক তাঁর স্বদেশ পর্যায়ের গান।

মুক্তিকামী দেশমাতৃকাকে কবি বিশুদ্ধ সমাজচেতনার সঙ্গে গ্রহণ করেননি, বরং তাঁর বিশ্বচেতনার অঙ্গরূপেই স্বদেশসত্তা তাঁর কাছে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনই সর্বপ্রথম কবিকে প্রদীপ্ত জনসঙ্গীত ও জাতীয় সঙ্গীতরচনায় বিপুলভাবে উদ্বুদ্ধ করে। ১৩ বছর বয়সে জাতীয় হিন্দুমেলার সংস্পর্শে ও ঠাকুরবাড়ির বিশেষ পরিবেশে তাঁর সুকুমার কবিচিহ্নে যে জাতীয়তাবোধের স্ফূরণ হয়েছিল তার মুদ্রাচিহ্ন—

“তোমারি তরে মা সঁপিণু এ দেহ

তোমারি তরে মা সঁপিণু এ প্রাণ।”

এই গানটি থেকে সহজেই অনুমেয় যে স্বদেশকে মাতৃরূপে কল্পনা করে অসীম স্বদেশপ্রীতি ও সুগাঢ় ভালোবাসার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল শৈশব থেকেই।

জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার সময়কালে রচিত ও প্রকাশিত গানগুলির মধ্যে দুটি গানে স্বদেশপ্রেমের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি। প্রথম গানটি হল -

“আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি

তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী।”

১৩০৩ সালে রচিত কবির আর একটি স্বদেশসঙ্গীত ‘অয়ি ভুবনমনোমোহিনী’ গানটির উল্লেখ এক্ষেত্রে এসে যায়। এই গানটির নেপথ্যের ইতিহাস বলা আছে পুলিনবিহারী সেনকে লেখা কবির একটি পত্রে—

“একদিন আমার পরলোকগত বন্ধু হেমচন্দ্র মল্লিক বিপিন পাল মহাশয়কে সঙ্গে করে একটি অনুরোধ নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন। তাঁদের কথা ছিল এই যে, বিশেষভাবে দুর্গামূর্তির সঙ্গে মাতৃভূমির দেবীরূপ মিশিয়ে দিয়ে তাঁরা শারদীয় পূজার অনুষ্ঠানকে নূতনভাবে দেশে প্রবর্তিত করতে চান, তার উপযুক্ত ভক্তি ও উদ্দীপনামিশ্রিত স্তবের গান রচনা করবার জন্যে আমার প্রতি তাঁদের ছিল বিশেষ অনুরোধ। আমি অস্বীকার করে বলেছিলুম এ ভক্তি আমার আন্তরিক হতে পারে না; সুতরাং এতে আমার অপরাধের কারণ ঘটবে। ...আমি রচনা করেছিলুম ‘ভুবনমনোমোহিনী’।...”^{১৬}

কিন্তু বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন উপলক্ষে দেশমাতৃকার মূর্তিগ্রাহ্য রূপকে কবি আর অবহেলা করতে পারেননি। বিমূর্ত বিশ্বাসের কবিকেও অন্তত একবার স্বদেশচেতনার কাছে পৌত্তলিক হতে হল। এই গানে কবি মিলিয়ে দিয়েছেন দেবীপুরাণে বর্ণিত মহামায়ার চিত্ররূপের সাথে দেশমাতৃকাকে। তাঁর বঙ্গপ্রতিমা দ্বিভুজা। দক্ষিণহাতে খড়্গা, বামহাতে বরাভয়, স্নেহবৎসলা দেবীর ললাটনেত্রে অগ্নিতেজ। আকাশের বজ্রসম্ভব মেঘপুঞ্জ তারই আলুলায়িত কেশরাশি। স্বদেশের প্রতি কবির ভালোবাসার প্রকাশ তাঁর চিত্রিত দেশমাতৃকার রূপ এই গানে বিরাজমান।

দেশের প্রতি কবির গভীর প্রেমের প্রকাশ পায় আরও একটি গানে -

“সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে

সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে।”

মাতৃবন্দনা বা জননীস্তব নয়, দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন এই গান। বিশিষ্ট রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ ও অধ্যাপক প্রয়াত ড. অরুণকুমার বসুর কথায় -

“এমন মুহূর্ত আসে আমাদের জীবনে যে মুহূর্তে মনে হয় মৃত্তিকাকে দু-হাতে আলিঙ্গন করি, আপনাকে বিগলিত করে এই বাংলার নদীস্রোতে মিশে যাই, ধূলি হয়ে ছড়িয়ে পড়ি, মনে হয় এই জন্মের মতো পুণ্যায়ু নশ্বর আশ্চর্য অপ্রত্যাশিত নরজন্ম ইহলোকে আর কেউ কোনোদিন যেন পায়নি। ... সেই অনুভূতিকে অপরের চিত্তে অনুরূপভাবে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দেওয়ার সার্থক সঙ্গীত ‘সার্থক জনম আমার’।”^{১৭}

এই প্রসঙ্গে এসে যায় আরও একটি গানের কথা যেখানে ফুটে ওঠে দেশের প্রতি ভালোবাসা—

“ও আমার দেশের মাটি

তোমার ‘পরে ঠেকাই মাথা।’”

‘আমার (সোনার) গৌর কেনে কেঁদে এল নরহরি’ প্রচলিত এই বাউল সুরের আবহে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন স্বদেশের প্রতি ভালোবাসার প্রকাশস্বরূপ এই গানটি। এ গানে দেশমাতৃকার প্রতি ভালোবাসার পাশাপাশি দেশের সেই সময়কার কিছু সামাজিক অবস্থার প্রতি ক্ষোভের প্রকাশ—

“আমার জনম গেল বৃথা কাজে

আমি কাটানু দিন ঘরের মাঝে

তুমি বৃথা আমায় শক্তি দিলে শক্তিদাতা।।”

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অঞ্জলিপুটে রচিত অনেকগুলি গানেই কবি একজাতীয় আত্মদীপ অভিযাত্রার কথা লিখেছেন। সেখানে সমবেত জনতার প্রতি আহ্বান নয়, কেবল নিঃসঙ্গ একক মাতৃসেবার অভিপ্রায়ই তীব্র হয়ে উঠেছে। যেমন ‘যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক’, ‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে’ ইত্যাদি।

“রবীন্দ্রনাথ কি শুধুই সংঘবদ্ধ বিক্ষোভ-উত্তাল জনতার কণ্ঠে ব্যবহারের জন্য ফরমায়েসি গান লিখেছেন? এ কথা আজ নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না যে তাঁর তৎকালীন স্বদেশ পর্যায়ে গানগুলি শুধুই ভাবোদ্বেল আবেগসমুখ সৃষ্টি ছিল না। তাঁর কাছে স্বদেশ ছিল অনেক বড়ো। এ জন্যই তিনি বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে শুধুই সরব প্রতিবাদ জানাননি, তার পাশে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশী সমাজের পরিকল্পনাও পেশ করেছিলেন।”^{১৮}

এছাড়াও যে গানে স্বদেশের প্রতি কবির প্রেমানুভূতি সর্বাধিক প্রত্যক্ষ করা যায়, ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে যা রচিত হয় এবং পরবর্তীকালে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতরূপেও যা গৃহীত হয়। গানটি হল -

“আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।”

স্বদেশের প্রতি কবির প্রেম গভীরভাবে ব্যক্ত। তাই তো কবি বলেন -

“চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে

ওমা আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।”

অতএব বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ্য করেই হোক বা তার আগের বা পরের রচনাই হোক, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশের গান কখনও দেশকে নিয়ে স্পর্ধা দেখায় না, আত্মকালন করে না, অন্য দেশকে তুচ্ছ করে না। তাঁর গানে দেশপ্রেমের ব্যাকুলতাই যেন হয়ে ওঠে প্রতিবাদ - এক অন্যতর প্রতিবাদ।

উপসংহার : রবীন্দ্রনাথের সারাজীবনে রচিত সংগীতগুলির দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি তা হলে দেখা যাবে যে তার প্রায় সবকটিতেই প্রেম কোন না কোন ভাবে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করেছে। এই বিষয়টি এমনি বৃহৎ যে শুধুমাত্র এই বিষয়টি নিয়েই গবেষণামূলক কাজ হতে পারে। প্রশ্নোত্তর বা একটি প্রবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে এই বিষয়ের বিস্তৃত ব্যাখ্যা বা আলোচনা

প্রায় দূরূহ। তবু উদাহরণস্বরূপ যে চারটি পর্যায়ের গান নিয়ে আলোচনা করা হল তার মাধ্যমে এটুকু প্রকাশিত হয়ে পড়ে যে রবীন্দ্রনাথের গানে প্রেম এক বৈচিত্র্যপূর্ণ সহাবস্থান। তবে শুধু পূজা, প্রেম, প্রকৃতি বা স্বদেশ নয় তাঁর বিচিত্র, আনুষ্ঠানিক এমনকি নাটকের (উদাহরণস্বরূপ মায়ার খেলা, চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা, চণ্ডালিকা প্রভৃতি) গানেও প্রেমের আবেগ সুস্পষ্ট। গানের প্রেক্ষাপট হিসেবে বৈচিত্র্যপূর্ণ সহাবস্থানে প্রেম অপরিহার্য। এই গানগুলি রবীন্দ্রনাথের মৌলিকতার বিচারে স্বতন্ত্র ও অনবদ্যতাকে প্রমাণ করে। তাই কবির ভাষাতেই বলা চলে—

“প্রেম বলে যে যুগে যুগে
তোমার লাগি আছি জেগে।”

অথবা -

“প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে
প্লাবিত করিয়া নিখিল দু্যলোকে ভুলোকে
তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া।”

Reference:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৩১ (পত্রপুট, সংখ্যা ১৫)
২. বসু, অরুণ কুমার, বাংলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্র সংগীত, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৭৮, পৃ. ৪৫৬
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, কনিকা এবং বীরেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রসংগীত : কাব্য ও সুর, শঙ্খ প্রকাশন, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪১
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, কনিকা এবং বীরেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রসংগীত : কাব্য ও সুর, শঙ্খ প্রকাশন, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৮
৫. বসু, অরুণ কুমার, বাংলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত, পৃ. ৫৯৫
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'প্রেম', শান্তিনিকেতন, ১ম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৯০৯, পৃ. ১৫
৭. মজুমদার, শৈলজারঞ্জন, রবীন্দ্রসংগীত চিন্তা, পৃ. ৮
৮. দাশ, শিশির কুমার, 'নায়ক-নায়িকা', রবীন্দ্রনাথের গান : সঙ্গ-অনুষঙ্গ, আলপনা রায় সম্পাদিত, পৃ. ৬১
৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৫শ খণ্ড (শতবার্ষিকী সংখ্যা), পৃ. ১০৬
১০. শাশমল, সুধাংশু, ধ্বনির শিল্প রবীন্দ্রসংগীত' দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ২৫৯
১১. চক্রবর্তী, সুধীর, গানের লীলার সেই কিনারে, প্রতিভাস, পৃ. ১৩৬
১২. ঘোষ, শঙ্খ, 'এ-আমির আবরণ', রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান, সুভাষ চৌধুরী সম্পাদিত, পৃ. ৫২
১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ছিন্নপত্রাবলী, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, পৃ. ৩২৭
১৪. ঘোষ, শান্তিদেব, রবীন্দ্রসংগীত, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, পৃ. ১১১
১৫. বসু, অরুণ কুমার, বাংলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত, পৃ. ৪৩২
১৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সংগীতচিন্তা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, পৃ. ২৪৬
১৭. বসু, অরুণ কুমার, বাংলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত, পৃ. ৫৪২-৫৪৩
১৮. বসু, অরুণ কুমার, আমার আপন গান, একুশ শতক, পৃ. ১৭